জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা ঃ চোদ্দ

মানসিক ব্যাধি

ডাঃ লালমোহন ঘোষ

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

শুভেচ্ছা

একটি সুস্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সবল দেহ ও স্বাভাবিক মনের অধিকারী কোন ব্যক্তিকেই কেবল স্বাস্থ্যবান বলা চলে। আমার সুস্থতার জন্য আমার ব্যক্তিগত দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং যে সমাজে আমি বাস করি তার অবস্থা যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের দাবী অতএব এক বিরাট দাবী–তা মেটানো কেবলমাত্র ডাক্তারের ওপরই নির্ভর করে না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবিকার সংস্থান, নির্মল পরিবেশ, সুস্থ সংস্কৃতি—স্বাস্থ্য পেতে গেলে এগুলিই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন। এবং এগুলি নির্ভর করে শোষণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবনমুখী সংস্কৃতির ওপর। তাই স্বাস্থ্যের আন্দোলন একটি ব্যাপক আন্দোলন, যাতে সামিল হতে হবে সমাজের সব স্তর ও পেশার মানুষকে।

"নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" সংস্থা জনমনে স্বাস্থ্য চেতনার প্রসারে এবং ব্যাপক জনতাকে স্বাস্থ্যের দাবীতে সংগঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। প্রতি দু মাসে এরা একটি করে ইতিমধ্যে পনেরোটি স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, শহর-গ্রামের অনেক জায়গায় স্বাস্থ্যের সভা-আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছেন। মানসিক রোগীদের সম্পর্কে তাদের নতুন প্রকল্পের কথাও সাগ্রহে শুনলাম।

এদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক, ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রান্তে-উপান্তে। অগ্রজ সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে এদের এবং এদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছা রইলো।

মার্চ 24, 1988

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আমাদের কথা

মানুষের অধিকাংশ আধিব্যাধির বেলায় দেখা যায় যে রোগের আপাত কারণের পেছনে একটি সামাজিক কারণও থাকে। তাই এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যে প্রত্যক্ষ কারণ ও আশু প্রতিবিধানের সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষিতের আলোচনা এবং স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিতও থাকে। যেসব ব্যাধির সূচনায় সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়ে, তা হলো মানসিক ব্যাধি। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ মানসিক রোগেরই উৎপত্তি হয় পারিবারিক তথা সামাজিক অব্যবস্থা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। এসব রোগের নিরাময়ের পন্থাটিও পরিবার তথা সমাজের সহায়ক ভূমিকার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে আমাদের এক স্বচ্ছ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। জনমনে এ বিষয়ে কিছু চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এবারের প্রকাশনা "মানসিক ব্যাধি"। আমরা এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করবো, আলোচনাচক্র সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থাও করবো।

অপর্যাপ্ত হলেও দৈহিক রোগের নিরাময়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা আমাদের দেশে কিছু কিছু আছে। মানসিক রোগ যদিও পরিসংখ্যানের বিচারে জনস্বাস্থ্যের একটি বড়ো মাপের সমস্যা, এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এদেশে এখনও গড়ে ওঠে নি। আমাদের সংস্থা তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য সত্ত্বেও এবিষয়ে কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমরা মনোরোগীদের জন্য কলকাতায় একটি 'ডে হোম' এবং বীরভূম ও বর্ধমান কাটোয়া অঞ্চলে দুটি আবাসিক প্রকল্প গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। আবাসিক প্রকল্পের জন্য জমি ব্যক্তিগত দানে সংগৃহীত হয়েছে, ডে-হোমের জন্য আমরা কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে একটি আস্তানার সন্ধানে আছি। সমাজসচেতন সকল মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা আমাদের উদ্যোগে যুক্ত হোন এবং প্রকল্পগুলি রূপায়িত করতে সহায়তা করুন।

পুস্তিকাটি রচনায় ব্যাঙ্গালোরের "ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস" সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখক ও 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' ঋণ স্বীকার করছেন।

মার্চ 30, 1988.

সুখময় ভট্টাচার্য
কর্মসচিব

প্রথম প্রকাশ : মার্চ 31, 1988.

মানসিক ব্যাধি

আমাদের সমাজে কোন ব্যক্তি কোন দৈহিক রোগে আক্রান্ত হলে তিনি আত্মীয়বন্ধু, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের সহানুভূতি পান। সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোগীর সর্বোত্তম চিকিৎসা কোন ডাক্তারের কাছে বা কোন হাসপাতালে সম্ভব তার হদিশ বাতলান, রোগীর পরিবারকে সহায়তার ভরসা যোগান। রোগার্ত আত্মীয়কে নিয়মমতো দেখতে যাওয়া নিকটজনের একটি আবশ্যিক কর্তব্যকর্ম বলে গণ্য হয়। কিন্তু কেউ যদি কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত হন, তার বেলা উল্টোটাই ঘটতে দেখা যায়। রোগার্ত পান সমাজের অবহেলা ও বিরূপতা, তার পরিবার সহসা এই নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে তারা অন্য সকলের দ্বারা ক্রমেই পরিত্যক্ত হচ্ছেন এবং ফলে তারা এক বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়ে পড়েন।

যে সমাজ দৈহিক রোগে আর্তজনকে সহানুভূতির হাত বাড়ায়, সেই সমাজই মনোরোগীর বেলায় বিদ্রূপ ও উপেক্ষা করে কেন? এই আপাত বিরোধী আচরণের কারণ হচ্ছে, আমরা মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত নই। সঠিক ধারণা না থাকার ফলে আমাদের সমাজে মনোরোগ সম্পর্কে নানা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে। মনোরোগীর প্রতি বিরূপতা এই সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের ফলশ্রুতি। মানসক্রিয়ার কোন ব্যত্যয়ের ফলে উদ্ভূত অবস্থাগুলিকে আমরা রোগ বলে ভাবতে শিখি নি, আমরা অনেকেই অবগত নই যে এসব রোগের বিজ্ঞানসম্মত নিরাময়ের ব্যবস্থা আছে।

এই সমাজগত অজ্ঞতারই প্রতিফলন আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাই। আমাদের দেশের চিকিৎসা পাঠ্যক্রমে মানবদেহ এবং তার বিভিন্ন বৈকল্য সম্পর্কে বিস্তারিত শেখানো হয়, কিন্তু মনের গঠন ও বিকাশ এবং তার বৈকল্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই শেখানোর ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশে চিকিৎসা বাবদ যে সরকারী অর্থ বরাদ্দ থাকে, মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যয়িত হয় তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। মনোরোগীর চিকিৎসার জন্য মুষ্টিমেয় যে কটি হাসপাতাল আছে, তাতে মনোরোগ চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা থাকে না। মানসিক রোগার্তকে পুনর্বাসনের জন্য কোন সরকারী বেসরকারী

প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। মনোরোগীকে হয় গৃহে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখাতেই তাদের প্রতি সমাজের করণীয় ভূমিকা শেষ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে মানসিক ব্যাধির ব্যাপকতা সম্পর্কেও আমরা অনেকেই অবগত নই। আমাদের ধারণা, মনোরোগ উন্নত দেশগুলিরই সমস্যা। তীব্র প্রতিযোগিতার যান্ত্রিক জীবন, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদির ফলে সেসব দেশের মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়, আমাদের দেশে মনোরোগ এখনও তেমন সমস্যা নয়। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানসিক ব্যাধি উন্নত ও অনুন্নত দেশে সমান ব্যাপকতায় ঘটে শহরে ও গ্রামে মনোরোগীর সংখ্যা প্রায় সমতুল। ভারতেও ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন সমীক্ষায় এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, আমাদের জনসংখ্যার এক শতাংশ গুরুতর মানসিক রোগের শিকার, প্রায় দশ শতাংশ অল্পতর মাত্রার মানসিক রোগে ভোগেন। মৃগীরোগে ভোগেন এক শতাংশ জনগণ, তিন শতাংশ মানসিক ন্যূনতার বলি। এছাড়া প্রায় পনেরো থেকে বিশ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভোগেন, দৈহিক ব্যাধিরূপে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সমস্যাটা অতএব বিশাল। সমাধানের পন্থা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে তার জন্য প্রয়োজন মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে আমাদের এক স্বচ্ছ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী। এর পূর্বশর্ত হিসেবে মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে।

মানসিক ব্যাধি কী ?

আমাদের কারুরই মানসিক অবস্থা সবসময় এক পর্যায়ে থাকে না। রোজকার জীবনের নানা ঘটনায় আমরা কখনো আনন্দ পাই, কখনো বা বিষাদ ; কখনো উত্তেজিত হই, কখনো অদ্ভুত আচরণ করে ফেলি। গম্ভীর কোন ব্যক্তি ঘটনা বিশেষে বাচাল হয়ে ওঠেন, বিশেষ অবস্থা বাচালকে করে গম্ভীর। কোন ঘটনা আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়ায়, রাতের ঘুম ব্যাহত করে। মানসিক অবস্থার এই পরিবর্তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের জীবনধারায় কোন বড় পরিবর্তন ঘটায় না।

পরীক্ষার আগে প্রায় সব ছাত্রই কমবেশী উৎকণ্ঠায় ভোগে। ভালোভাবে পাশ করতে পারবে কি না, ফেল করলে কী হবে ইত্যাদি হরেক চিন্তায় তাদের মন বিক্ষিপ্ত থাকে, আহার ও ঘুম কমে। কিন্তু বেশীরভাগ ছাত্রই

পরীক্ষার হলে যায় এবং পরীক্ষা দেয়। দু-একজন ছাত্রের বেলায় এই উৎকণ্ঠা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তারা ঠিকমত পড়তেও পারে না, পরীক্ষা দেয় না এবং এই উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতাবোধ ক্রমে বাড়তেই থাকে। অন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। সন্তান মারা গেলে সব মায়েরই জীবনে বিতৃষ্ণা জাগে, সব কিছুতে অবসাদ আসে, খাওয়া-ঘুমের ঠিক থাকে না। কিন্তু সকলেই ক্রমে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে আসেন। হয়তো কোন মা সন্তানের শোক ভুলতেই পারছেন না মাসের পর মাস, হারানো সন্তানের জন্য আজও কাঁদেন, অন্য ছেলেমেয়ে ও ঘরসংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। **মনের এধরনের দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিকতাই মানসিক ব্যাধি।**

মানসিক ব্যাধি হলো এমন এক অবস্থা যাতে—

1. কোন ব্যক্তির চিন্তায়, অনুভূতিতে, স্মৃতিতে, বোধে এবং বিচার-বিবেচনায় অস্বাভাবিকতার ফলে তার আচরণ ও কথাবার্তায় পরিবর্তন ঘটে।
2. এই পরিবর্তন ঐ ব্যক্তি বা তার নিকটজনের অস্বস্তি ও দুঃখের কারণ হয়।
3. এই অস্বাভাবিকতা ঐ ব্যক্তির নিজের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ও অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কে পরিবর্তন আনে।

মানসিক ব্যাধির প্রকাশ ঃ

মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাঘাত ঘটে। মনোরোগীর কাজে ও আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন আসে, তা নীচে বর্ণিত হলো। তবে সবগুলিই যে প্রত্যেক মনোরোগীর ক্ষেত্রে ঘটবে, এমন কোন কথা নেই।

(1) **শারীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় ঃ**

(ক) ঘুম—রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। বিছানায় শুয়ে বা বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, ঘুম আসে না। অথবা মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসে না। অথবা গভীর ঘুমের বদলে অনিয়মিত পাতলা ঘুম হয়। অনেকের সমস্ত রাতটাই বিনিদ্র কাটে। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে সকালে এদের দেহমনের সতেজ ভাবটা থাকে না।

(খ) **আহারে রুচি ও খাদ্যগ্রহণ**—রোগীর আহারে রুচি থাকে না এবং সে কম খাবার খায়। অথবা আহারে রুচি থাকলেও সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে না। তার ওজন কমতে শুরু করে।

(গ) **মলমূত্র ত্যাগ**—রোগী ঘন ঘন প্রস্রাব করে। সে পাতলা পায়খানা করে বা তার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। অনেক রোগী জামাকাপড়েই মলত্যাগ করে এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

(ঘ) **যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যৌনক্রিয়া**—রোগীর যৌনাকাঙ্ক্ষা কমে। সে যৌনক্রিয়ায় অক্ষমও হয়ে পড়তে পারে।

(2) **মানসিক ক্রিয়ার ব্যত্যয় ঃ**

(ক) **আচরণ**—রোগী দুর্বোধ্য ও বিচিত্র আচরণ করে। তার আচরণ পরিবারের অন্যান্যের বিরক্তি জাগায়, অনেক সময় তাদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে। তার আচরণ তার নিজের বা অন্যের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। সে অস্থির ও অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল হয় এবং অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ায়। সে অন্যকে গালিগালাজ করে এবং তুচ্ছ বা বিনা কারণে অন্যকে মারধোর করে।

আবার কোন রোগী স্থির অবস্থায় কোন কাজ না করে শুয়ে বা বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, নিজের নিতান্ত দৈহিক প্রয়োজনেও নড়াচড়া করতে তার অনীহা। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন হাস্যকরভাবে নাড়াচাড়া করে যা অন্যের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) **কথাবার্তা**—রোগী বিনা প্রয়োজনে প্রচুর কথা বলে অথবা প্রয়োজনেও কথা কম বলে বা একদম নিশ্চুপ থাকে। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সে বিচিত্র ও ভ্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করে যা অন্যের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যেমন সে বলে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তার খাবারে বিষ মেশানো হচ্ছে।

(গ) **আবেগ ও অনুভূতি**—কোন ঘটনায় রোগীর মাত্রাতিরিক্ত এবং/অথবা অস্বাভাবিক আবেগের সঞ্চার হয়। কারুর আবার আবেগের প্রকাশ আদপেই ঘটে না। সে পাথরের মূর্তির মত ঠায় বসে থাকে, কোন কারণ ছাড়াই নিজের মনে হাসে কাঁদে।

(ঘ) **বোধ**—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেসব বার্তা দেহে পৌঁছয়, সেগুলি বোঝার ক্ষেত্রে রোগীর বৈকল্য দেখা দেয়। সে সেগুলির ভুল ব্যাখ্যা

করে। অন্যে কিছু শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না, অথচ সে অনেক কিছু শুনছে বা দেখছে।

মনোরোগী যে কোন কারণ ছাড়াই অনেক কিছু দেখে ও শোনে, একে বলে 'বিভ্রম'। সে দেখে, অনেক লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। ভীত হয়ে সে পালাতে চায় অথবা অন্যকে আক্রমণ করে বসে। সে শুনতে পায়, কেউ যেন তাকে গালিগালাজ করছে। সে উত্তেজিত হয়ে সেই কল্পিত ব্যক্তির উদ্দেশে গালাগালি শুরু করে, তাকে শাসায়। যে রোগীর বিভ্রম ঘটেছে, সে নিজে নিজে কথা বলে, নিজের মনে কাঁদে হাসে, উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং অযথা তর্ক করে, অদ্ভুত আচরণ করে।

(ঙ) **স্মরণ শক্তি**—রোগীর স্মরণশক্তি কমে আসে, জরুরী অনেক কথা তার মনে থাকে না। কয়েক মিনিট আগে দেখা বা শোনা কোন অভিজ্ঞতা সে ভুলে যায়। নিজের চশমা, কলম, ছাতা কোথায় রেখেছে তার মনে থাকে না। কয়েকদিন আগে সে কী করেছে বা কার কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সে সব ভুলে যায়। অতীত স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে।

(চ) **বুদ্ধি ও বিচারশক্তি**—কিছু মনোরোগে বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে আসে। রোগী বিচারবুদ্ধি হারায়, দৈনন্দিন কাজে ভুল করে। সে সাধারণ হিসেবও বোঝে না, নির্বোধের মত আচরণ করে।
অনেক সময় বিভিন্ন অবস্থায় তার সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে আসে বা একদম লোপ পায়। রোগী এমন ভুল সিদ্ধান্ত করে যাতে তার নিজের বা অন্যের ক্ষতি হয়।

(ছ) **চেতনা**—মস্তিষ্কে আঘাতজনিত মনোরোগে রোগীর চেতনায় পরিবর্তন আসে। সে সময় ও স্থানের ধারণা হারায়, নিজের আত্মীয়জনকেও চিনতে পারে না।

(3) **ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজের ব্যত্যয়ঃ**

(ক) **ব্যক্তিগত**—রোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মুখ ধোয়া, চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কাটা, স্নান করা ইত্যাদি নিজের দৈহিক কাজকর্মও সে করে না। সে অপরিষ্কার থাকে। সে জামাকাপড়, বিছানাপত্তর নোংরা করে ফেলে।

(খ) **সামাজিক**—পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং

অন্যান্যদের সঙ্গে রোগী অদ্ভুত আচরণ করে। সে তাদের অপমান করে, মারধোরও করে। তার ব্যবহারে অনেকে তার প্রতি বিরক্ত হয়, অনেকে তাকে উপহাস করে। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে সে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।

মানসিক ব্যাধি কেন হয় ?

আমাদের আচারব্যবহার থেকে শুরু করে যাবতীয় মানসিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। বিভিন্ন কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটলে মনোরোগের কারণগুলিকে আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারি—

1) **মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঃ** মস্তিষ্কের গঠনগত বা ক্রিয়াগত পরিবর্তনের ফলে মনোরোগের উৎপত্তি হয়। স্নায়ুকোষের জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনই অধিকাংশ গুরুতর মনোরোগের কারণ। এসবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে মস্তিষ্কের কোন দৃশ্যগত পরিবর্তন ধরা পড়ে না। নানা কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন—(ক) কিছু সংক্রামক ব্যাধিতে (খ) আঘাত লাগলে (গ) রক্তসংবহন কমে গেলে (ঘ) মস্তিষ্কে রক্তপাতের ফলে (ঙ) দীর্ঘদিন মাদকাসক্তি থাকলে (চ) অপুষ্টিজনিত কারণে (ছ) অবক্ষয়ী রোগের ফলে।

2) **বংশগত কারণ ঃ** কোন কোন মনোরোগীর পরিবারের অন্য সদস্যের মধ্যেও অনুরূপ রোগ দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়। কিন্তু পূর্বতন কারুর মনোরোগ থাকলে পরবর্তী প্রজন্মে মনোরোগের প্রকাশ ঘটবেই, এমন কথা বলা চলে না। কিংবা হয়তো দু-এক-জনের মধ্যে ব্যাধিটি প্রকাশ পেলো, অন্যদের কিছুই হলো না। অবশ্য বেশীর ভাগ মনোরোগীর ক্ষেত্রেই পূর্বাপর কোন পারিবারিক ইতিহাস মেলে না।

3) **শৈশব অভিজ্ঞতা ঃ** শৈশবে পর্যাপ্ত স্নেহভালোবাসা, উপযুক্ত নির্দেশ ও সঠিক কাজে উৎসাহদান এবং নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা সুস্থভাবে বড় হওয়ার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। এসবের অভাব ঘটলে কিংবা শৈশবে পর্যায়ক্রমে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হলে পরবর্তী জীবনে মনো-রোগের সম্ভাবনা থাকে।

4) গৃহের পরিবেশ : পরিবারের লোকদের মধ্যে বনিবনার অভাব, ঝগড়া-ঝাঁটি, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও শীতল সম্পর্ক মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এমন পরিবারের কোন সদস্য পরবর্তী সময়ে কোন সংকটের মুখোমুখি হলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারে। কারণ, বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শিক্ষা তার থাকে না।

5) অন্যান্য কারণ : যদি কোন ব্যক্তি সমাজে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা না পায়, সে মনোরোগে আক্রান্ত হতে পারে যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অবিচার, নিরাপত্তার অভাব, তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি মানসিক অশান্তির কারণ ঘটায়।

মনোরোগের প্রকারভেদ :

মনোরোগ অনেক প্রকারের। এদের কতকগুলি গুরুতর প্রকৃতির, কতকগুলি মৃদুতর। মানসিক ব্যাধিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—

1. সাইকোসিস (বাতুলতা)
2 নিউরোসিস (উৎকেন্দ্রীকতা)
3. অন্যান্য—

ক) মৃগীরোগ (এপিলেপ্সি)

খ) মানসিক ন্যূনতা (মেণ্টাল রিটার্ডেশান। এই অবস্থাকে রোগ না বলে মনের অপূর্ণতা হিসেবেই দেখা হয়)

সাইকোসিস :

সাইকোসিস ভারী ধরনের মানসিক ব্যাধি। সাইকোসিসের রোগী বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারায়, নিজের জগতে বাস করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলি তারা নিজেরা মেটাতে পারে না। নিজেদের অসুস্থতা সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই, এরা অন্যকে দোষ দেয়। তারা অনেক কিছু দেখে বা শোনে, যা অন্য কেউ দেখতে বা শুনতে পায় না। অনেক সময় এরা এমন সব অলীক কথা বলে, যা অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে মনে হয় না। কোন রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস টলানো যায় না। এইসব অলীক অনুভূতির ফলে সাইকোসিসের রোগী উদ্ভট আচরণ করে, তার কথাবার্তা ও চিন্তাধারা অস্বাভাবিক হয়ে যায়, দৈনন্দিন কাজকর্ম

থেকে তারা সরে যায়! এর ফলে তারা নিজেরা তো ভোগেই, আত্মীয়জন ও পাড়াপ্রতিবেশীরও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বেশীর ভাগ সাইকোসিস রোগীর ক্ষেত্রেই সরাসরি কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। মনে করা হয়, একাধিক কারণের সম্মিলিত ফলেই ব্যাধিটির উদ্ভব ঘটে। যেসব সাইকোসিসের কারণ নির্ণীত হয় না, তাদের বলে 'ফাংশানাল সাইকোসিস'। কিছুক্ষেত্রে দৈহিক কোন রোগে বা মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে সাইকোসিস হতে পারে। এগুলিকে বলা হয় 'অর্গানিক সাইকোসিস।'

সাইকোসিসের প্রকাশ বিভিন্নরূপে ঘটতে পারে। রোগের সূচনা, তার গতিপ্রকৃতি, কতদিন ধরে চলছে এবং পরিণতি কেমন হতে পারে, এসবের বিচারে সাইকোসিসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় —

ক) **অ্যাকিউট সাইকোসিস**—হঠাৎ শুরু হয়, কোন কারণ থাকতে পারে, এবং কিছুদিনের চিকিৎসায় সেরে যায়।

খ) **রেকারেণ্ট সাইকোসিস**—পর্যায়ক্রমে ব্যাধির আক্রমণ ঘটে। দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়ে রোগের লক্ষণ প্রশমিত হয়, রোগী সুস্থ থাকে।

গ) **ক্রনিক সাইকোসিস**—আস্তে আস্তে শুরু হয়, ক্রমে প্রকোপ বাড়ে এবং চিকিৎসা না করালে রোগীর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে।

বোঝার সুবিধার জন্য সাইকোসিসের প্রতি বিভাগের দু- একটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

ক) ত্রিশ বছরের প্রতিমা এক মৃদুভাষী, বিবাহিতা মহিলা। দুটি সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার। পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্যে তাদের দিন কাটে। দু সপ্তাহ আগে প্রতিমার ছ বছরের ছেলেটি মারা যায়। তারপর থেকেই সে অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করেছে, অবিরাম বক্‌বক্‌ করছে, তার কথাবার্তা অসংলগ্ন, দুর্বোধ্য। প্রতিমার নাওয়া-খাওয়া, পোষাক-আষাক, ঘুমের ঠিক-ঠিকানা নেই। সে প্রায়ই কাঁদে ও যাকে পায় তাকে হারানো ছেলে ফিরিয়ে এনে দিতে বলে। সে অন্যকে দোষারোপ করে, সময় সময় মারমুখীও হয়ে ওঠে।

প্রতিমার হয়েছে অ্যাকিউট সাইকোসিস। হঠাৎ সূচনা ও অল্পদিনের বৈকল্য। উপযুক্ত চিকিৎসায় এ ধরনের সাইকোসিস সেরে যায়। তবে কিছু-ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ক্রনিক সাইকোসিসে পরিণত হতে পারে।

খ) চল্লিশ বছরের ধীরেন একজন শ্রমিক। ভদ্র, নম্র মানুষ, ঠিকমতো কাজে যায়, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব। মাসখানেক হলো ধীরেনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তার ঘুম কমে গেছে, সে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, দৌড়ঝাঁপ বেড়ে গেছে, তার বকবকানির চোটে সকলে অস্থির। সে নিজেই কথা বলবে, অন্যকে বলতে দেবে না, কথায় কথায় হো হো করে হেসে ওঠে। সে দম্ভ করে বলে যে সে একটা কেউকেটা লোক, তার অসাধ্য কিছু নেই। তার বাগাড়ম্বরে সায় দিলে ঠিক আছে, কেউ বিরোধিতা করলে সে উত্তেজিত ও মারমুখী হয়ে ওঠে। তার আচার আচরণে বাড়ীর লোকেরা চিন্তিত। জিজ্ঞাসায় জানা গেলো, চার বছর ও দু বছর আগে দুবার ধীরেনের এরকম হয়েছিলো এবং প্রতিবার মাস দু-তিন এই অবস্থা চলেছিলো।

ধীরেনের হয়েছে রেকারেণ্ট সাইকোসিস, চিকিৎসকেরা বিশেষার্থে একে **'ম্যানিয়া'** বলে থাকেন। মাঝে মধ্যে হয়, দু-চার দিন থেকে দু-চার মাস চলে, তারপর চিকিৎসায় বা আপনা থেকেই ভালো হয়ে আসে, আবার কিছু-দিন পরে হয়।

পঁয়ত্রিশ বছরের গৌরীও রেকারেণ্ট সাইকোসিসে ভুগছে। বিবাহিতা মহিলা, তিন সন্তানের জননী। মাস দুই হলো কোন কারণ ছাড়াই তার মনে এক বিষাদভাব চলছে। সে দুর্বল বোধ করে, অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাত দুটোয় তার ঘুম ভেঙে যায়, তারপরে আর ঘুম আসে না। কারণে অকারণে সে কাঁদে, নিজেকে দোষী মনে করে, সবসময় তার আশংকা এই বুঝি তার সাংঘাতিক কিছু হলো। ভবিষ্যৎ তার কাছে অন্ধকার, জীবন অর্থহীন। একবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো। গৌরীর পরিবারের লোকেরা তার এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ না বুঝতে পেরে বিভ্রান্ত।

যে ধরনের সাইকোসিসে গৌরী ভুগছে, তাকে বলা হয় **'অবসাদ'**। অবসাদ যে কোন বয়সের স্ত্রীপুরুষের হতে পারে এবং কোন আপাত কারণ ছাড়াই শুরু হতে পারে। চিকিৎসা না করালে প্রকোপের মাত্রা বাড়ে, রোগী আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দু-চার মাসে রোগ কমে আসে, রোগী ভালো থাকে, কিন্তু ভবিষ্যতেও আবার ঘটে।

ম্যানিয়া ও অবসাদ রেকারেণ্ট সাইকোসিসের দুধরনের প্রকাশ। একটিতে রোগী বিনা কারণে অত্যধিক প্রফুল্ল হয়, অপরটিতে বিষাদগ্রস্ত। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ম্যানিয়া ও অবসাদ পর্যায়ক্রমে ঘটে, মধ্যে কিছুকাল আপাত সুস্থ অবস্থায় কাটে। যথাযথ চিকিৎসায় রেকারেণ্ট সাইকোসিস নিরাময় হয়।

(গ) আঠারো বছরের সীতাংশু বি. এস. সি -র ছাত্র। হাসিখুশী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তরুণটি কর্তব্যপরায়ণ ও ব্যবহারে যথেষ্ট সামাজিক। বছর খানেক আগে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সে যেন সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, খুব মেজাজী হয়ে উঠছে, তার সক্রিয় ভাব চলে যাচ্ছে, নিজের রোজকার কাজকর্মেও উদাসীন হয়ে পড়ছে। যখন একা থাকে, তাকে নিজের মনে কথা বলতে, হাসতে ও নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে দেখা যায়। সে বলে তার খাবারে বিষ মেশানো হয়, দুজন লোক তাকে শাসায় ও মারতে আসে। সে কখনও খুব উত্তেজিত থাকে, কখনও চুপচাপ বসে থাকে, অকারণে হাসে কাঁদে। সীতাংশু স্নান করে না, নোংরা জামাপ্যাণ্টও পাল্টায় না, কলেজ যাওয়া পড়াশুনা করা ছেড়ে দিয়েছে।

সীতাংশুর হয়েছে ক্রনিক সাইকোসিস। কোন আপাত কারণ ছাড়াই তার রোগের সূত্রপাত হয়েছে, রোগের অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। এই ধরনের সাইকোসিস সাধারণত পনেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সীদেরই হয়ে থাকে। ডাক্তাররা এই রোগকে বলেন 'স্কিজোফ্রেনিয়া'। উপযুক্ত চিকিৎসায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং নিয়মিত চিকিৎসা তৎসহ উপযুক্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত করে রোগীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব। চিকিৎসা না করালে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। রাস্তায় ঘাটে আমরা যেসব 'পাগল' দেখি, তারা স্কিজোফ্রেনিয়ার শিকার।

ওপরে যেসব সাইকোসিসের কথা বলা হলো, সেগুলি হলো **ফাংশানাল সাইকোসিস**। এগুলির ক্ষেত্রে সঠিক নির্ণয় করা যায় না। **অর্গানিক সাইকোসিসে** বেলায় কিছু দৃশ্যগত কারণ পাওয়া যায়। অর্গানিক সাইকোসিসও অ্যাকিউট ও ক্রনিক হতে পারে। এ ধরনের সাইকোসিস মস্তিষ্কে আঘাত লেগে বা টিউমার হলে হতে পারে, অনেক শারীরিক ব্যাধিতেও হয়ে থাকে। অ্যাকিউট অর্গানিক সাইকোসিসে রোগীর চেতনার স্তরে পরিবর্তন ঘটে। এই সে মনোযোগী এবং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, পর মুহূর্তেই ঝিমোতে শুরু করেছে, অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। সে আর প্রশ্ন বুঝতে পারছে না, তাকে খুব উদ্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। প্রবল জ্বর, মস্তিষ্কে আঘাত, অত্যধিক মদ গাঁজা বা অন্য মাদকদ্রব্য সেবন এবং উচ্চ রক্তচাপে অ্যাকিউট অর্গানিক সাইকোসিস হতে পারে। এই ধরনের ব্যাধি নিরাময়যোগ্য।

ক্রনিক অর্গানিক সাইকোসিস সাধারণত পঞ্চাশোর্ধদের হয়ে থাকে। কোন বয়স্ক ব্যক্তির সাইকোসিসের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে স্মরণশক্তির ক্রমিক

অবনতি দেখা গেলে এই রোগের কথা ভাবতে হয়। রোগী সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যায়, টাকা কলম চশমা হারিয়ে ফেলে, চেনা জায়গাও তার কাছে অচেনা ঠেকে। সে নিজের ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনীর নাম ভুলতে শুরু করে, তার বুদ্ধি ও বিচারশক্তিও কমতে থাকে। সে খিটখিটে হয়ে ওঠে, ধৈর্য হারায়, অকারণে বা সামান্য কারণে হেসে বা কেঁদে ফেলে।

নিউরোসিস ঃ

অল্পমাত্রার কিছু মানসিক ব্যাধিকে নিউরোসিস গোত্রভুক্ত করা হয়। নিউরোসিসের রোগী সাইকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির মত কল্পিত জগতে বিচরণ করে না। বাস্তব জগতের সঙ্গে তার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় না, নিজের সমস্যা সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীর অশান্তির কারণ হয় না, যদিও রোগের ফলে সে ব্যক্তিগত অস্বস্তি ও কষ্ট ভোগ করে। বাড়ীতে, কর্মস্থলে এবং পাড়ায় তার কাজকর্ম, আচরণ ইত্যাদি কিছু বিঘ্নিত হয়, কিন্তু একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে না।

নিউরোসিসের প্রধান লক্ষণ হলো উদ্বেগ, ভয় এবং দুশ্চিন্তা। আমরা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগি, কিন্তু অবশেষে তা কাটিয়েও উঠি। যদি কারুর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মাত্রাতিরিক্ত হয় বা দীর্ঘ দিন ধরে চলে, তাহলে তার অস্বস্তির কারণ হয়, তার ব্যক্তিগত কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক নিউরোটিকই অসম্পূর্ণতা ও হীনমন্যতায় ভোগে, যার ফলে জীবনের সাধারণ কোন সমস্যাও তাদের কাছে জটিল মনে হয়। এতে উৎকণ্ঠা আরও বাড়ে, রোগী যে কোন সমস্যাকেই এড়িয়ে যেতে চায়। ক্রমে তার শরীর ও মনের ওপর প্রতিক্রিয়া পড়ে। নিউরোসিসের প্রায় সবক্ষেত্রেই কারণ হিসেবে সদ্য কোন উদ্বেগপূর্ণ ঘটনা বা ব্যর্থতার সন্ধান মেলে—তা সে কোন লোকের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরা, পারিবারিক কলহ, অসুখী বিবাহ, কর্মস্থলে সমস্যা, আর্থিক অনটন, ভারী কোন অসুখ অথবা কোন নিকটজনের মৃত্যু যাই হোক না কেন। উদ্বেগ-উত্তেজনা নিউরোটিক রোগীর নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়, সে অসহায়তার শিকার হয়, সহায়তার জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে।

নিউরোসিসের প্রকাশ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক—

সুনন্দা ত্রিশ বছরের বিবাহিতা মহিলা। আট বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু কোন ছেলেপুলে হয় নি। গত আড়াই বছর তার শ্বাসের কষ্ট এবং বুকে ও পেটে জ্বালা করে, মাঝে মধ্যে বুক ধড়ফড় করে। সে হার্ট স্পেশালিস্ট দেখিয়েছে। তিনি অনেক পরীক্ষা করে অভয় দিয়েছেন হার্ট ঠিক আছে। এ সত্ত্বেও সুনন্দার কষ্ট চলছেই। প্রায়ই সে ডাক্তার দেখায়, ভালো কিছু ওষুধ দিয়ে তার অসুখ সারিয়ে দিতে বলে।

চব্বিশ বছরের অতুল দর্জির কাজ করে। একবছরের ওপর হলো সে দুর্বলতা বোধ করছে। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পায়ে ব্যথা হয়। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, অনেক টনিক খেয়েছে, ইনজেকশান নিয়েছে। কিছুতেই কিছু হয় নি। তার ধারণা, সে যে মাঝে মধ্যে হস্তমৈথুন করে এবং ঘুমের মধ্যে তার যে বীর্য স্খালন হয়, তাই তার এ অসুস্থতার কারণ।

বত্রিশ বছরের শেফালীর সন্তান বন্ধের জন্য লাইগেশান অপারেশান হয়েছে এক বছর আগে। তারপর থেকেই ঘরকন্নার কাজ করতে তার কষ্ট হয়। সে দুর্বলতা বোধ করে, একটু কাজ করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাথা ভার হয়ে থাকে, পিঠে ও হাতপায়ে টান ধরে। তার খাওয়া ঘুম কমে গেছে। লাইগেশান অপারেশানই তার এই কষ্টের কারণ বলে তার নিজের ও পরিজনের ধারণা।

সুনন্দা, অতুল এবং শেফালী তিনজনেই নিউরোসিসে ভুগছে। তাদের এই মনোরোগের কারণ যথাক্রমে সন্তানহীনতা. বীর্যক্ষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অমূলক ভয় এবং বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশানে শরীরের ক্ষতি হয়েছে এই বিশ্বাস। কিছু নিউরোসিসের নির্দিষ্ট ধরন থাকে যাতে করে সেগুলিকে কয়েকটি বিভাগে ফেলা যায়। অনেক নিউরোসিসের ক্ষেত্রে লক্ষণাদি সুনির্দিষ্ট নয়।

নিউরোসিসের কয়েকটি সাধারণ রূপ হলো—

(ক) **অবসাদমূলক নিউরোসিস** ঃ প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বা মৃত্যু, সমাজে প্রতিষ্ঠার হ্রাস, অর্থ বা সম্পত্তি নাশ, ব্যর্থতা ও হতাশ অবসাদ আনতে পারে। মাথা ধরা, সারা শরীরে ব্যথা, দুর্বলতা, স্নায়ুদৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা নিয়ে রোগী আসে। জিজ্ঞাসা করলে দুঃখবোধ, ক্রন্দনমুখিনতা, কোন কিছুতে উৎসাহের অভাব এবং বেঁচে থাকার অসারতার কথা জানায়।

(খ) **দুশ্চিন্তামূলক নিউরোসিস** ঃ এই অসুখে রোগী অস্বস্তিভাব, অজানা ভয়, উৎকণ্ঠা, মনোযোগের অভাব, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি, শ্বাসকষ্ট,

মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঠিকমত কথা বলতে না পারা, হাতপায়ের কাঁপুনি, মাথা ধরা, সারা শরীরে ব্যথা, সহজেই ক্লান্ত হওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতির কথা বলে। প্রশ্ন করলে পরিবারে অশান্তি, আর্থিক সমস্যা, চাকুরীর অনিশ্চয়তা, যৌনজীবনে সমস্যা ইত্যাদির কথা বলে।

(গ) **হিস্টিরিয়া :** প্রত্যেকে তাদের মানসিক অস্বস্তির কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কারণ, কিভাবে বলতে হয় তা তারা জানে না বা মনের আবেগ ব্যক্ত করলে ফলাফল প্রীতিকর না হতে পারে ভেবে বলে না। কিন্তু তারা চায় অন্যে তাদের সমস্যার কথা জানুক, তাদের সহায়তা করুক। এই অবদমিত মানসিক আবেগ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। যেমন, সন্ন্যাস রোগের মত কারুর হাত-পা অবশ হয়ে যায়, কারুর স্মৃতিভ্রংশ হয়, কারুর মধ্যে সাইকোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারুর ফিট হয় ইত্যাদি। অন্যের নজর ও সহায়তা আকর্ষণ করে তারা তৃপ্তি পায়। **হিস্টিরিয়াকে কিন্তু রোগীর সচেতন মনের প্রয়াস ভাবলে ভুল হবে।** সে ইচ্ছাকৃতভাবে রোগের ভান করে না।

ঘ) **মানস-দৈহিক ব্যাধি :** দীর্ঘস্থায়ী আবেগজনিত সমস্যা ও উৎকণ্ঠার ফলে অনেকের দৈহিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমাগত মানসিক চাপের ফলে তাদের পেপটিক আলসার, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, গাঁট-ব্যথা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। দৈহিক অসুখ ভেবে ওষুধ দিলে সাময়িক উপশম ঘটে, ব্যাধি কিন্তু থেকেই যায়। পেপটিক আলসার অপারেশান করলেও নতুন জায়গায় আবার ঘা হয়। মানস-দৈহিক ব্যাধি মহিলা ও বয়স্ক পুরুষের মধ্যে বেশী হয়। ফ্যামিলি প্লানিং অপারেশান হয়েছে এমন লোকের মধ্যেও এসব রোগ বেশী হয়। রোগীকে বিস্তারিত প্রশ্ন করলেই রোগের মূল কারণটি জানা যায়।

নিউরোসিসের চিকিৎসা ওষুধের চেয়েও বেশী নির্ভর করে মূল কারণটি নির্ণয় করা এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে রোগীকে ঐ কারণ ও তার কষ্টের সম্পর্কে বোঝানো এবং রোগীর আত্মীয়জনকেও রোগের প্রকৃত তথ্যটি জানিয়ে রোগটির নিরাময়ে তাদেরও উদ্বুদ্ধ করার ওপর।

মৃগী রোগ :

ঘরে বাইরে অনেকে দেখে থাকবেন, একজন লোক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে থ্যকার পর তার শরীরে ঝাঁকুনি দেখা দিলো। নির্দিষ্ট সময় পর পর এরকম ঝাঁকুনি চললো দু-এক মিনিট।

মুখে ফেনা জমলো, কোন কোন ক্ষেত্রে জিভে গালে কামড় লেগে রক্তপাতও হলো। এই ব্যাধিটির নামই মৃগী রোগ। রোগী কয়েক মিনিটে জ্ঞান ফিরে পেতে পারে, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তার কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে। ফিটের পরে সাধারণত কিছু উপসর্গ দেখা যায়। যেমন, মাথা ধরা, বমি, ক্লান্তি, কথা জড়িয়ে যাওয়া, হাত পায়ের অবশতা কিংবা ফিটের পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। অনেকে উদভ্রান্তের মত আচরণও করে। ফিট হওয়ার আগে রোগী অনেক সময় কিছু লক্ষণ থেকে বুঝতে পারে যে তার ফিট হতে যাচ্ছে। যেমন, মাথা ঘোরা, ভয়, পেটে অস্বস্তি ইত্যাদি।

মৃগী রোগের ফিট প্রতিদিন বহুবার করে হতে পারে কিংবা সপ্তাহে বা মাসে একবার দুবার হতে পারে, আবার সারা বছরে মাত্র কয়েকবার হতে পারে। ফিট হতে পারে ঘুমের মধ্যে, ভীড়ের মধ্যে বা রোগীর একা থাকা অবস্থায়, পথ চলতে চলতে, অফিসে কাজ করতে করতে, গাড়ী চালানোর সময়, অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায়। মৃগী রোগ বাল্যে ও কৈশোরে বেশী দেখা যায়, অবশ্য যে কোন বয়সের স্ত্রী পুরুষেরই হতে পারে। মৃগী রোগ মস্তিষ্কের অংশবিশেষে হঠাৎ অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে হয়। অল্পবয়সের রোগীর বেলায় সাধারণত কোন সরাসরি কারণ পাওয়া যায় না, তবে কুড়ি বছরের বেশী. বয়সে মৃগী রোগ দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রেই তার একটা দৃশ্যগত কারণ মেলে। যেমন, মস্তিষ্কে আঘাত বা রক্তপাত, টিউমার, মদে বা অন্য মাদকে দীর্ঘকালীন আসক্তি ইত্যাদি।

মৃগী রোগ ওষুধ ব্যবহার এবং প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থায় ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিরাময় করা যায়।

মানসিক ন্যূনতা ঃ

মানসিক ন্যূনতাকে কোন অসুখ হিসেবে ধরা হয়. না বরং মনে করা হয়, এটি এমনএক অবস্থা যাতে মস্তিষ্কের অপূর্ণ পরিণতির ফলে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়নি। আমাদের বয়স বাড়লে দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা বুদ্ধিরও বৃদ্ধি ঘটে। যদি বয়সের হিসেবে কারুর মনের বৃদ্ধি তার শরীরের বৃদ্ধির তুলনায় পিছিয়ে থাকে, তাকে 'মানসিক ন্যূন' বা জড়বুদ্ধি বলা হয়। প্রায়ক্ষেত্রে পিতামাতাই সঠিকভাবে বলতে পারেন শিশুর মনের বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কি না।

বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে বুদ্ধি পরিমাপের একটি মাপকাঠি। মানসিক বয়স ও দৈহিক বয়সের অনুপাত কষে এটি নির্ণয় করা হয়—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{দৈহিক বয়স}} \times 100$$

ধরা যাক, কোন শিশুর দৈহিক বয়স 10 বছর, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেলো তার মানসিক বয়স 5 বছর। অর্থাৎ তার বুদ্ধ্যঙ্ক হলো 50, অর্থাৎ শিশুটি মাঝারি মাপের জড়বুদ্ধি। অধিকাংশ লোকের বুদ্ধ্যঙ্ক 90-110. বুদ্ধ্যঙ্ক 70 এর নীচে হলে মানসিক ন্যূনতা বলা হয়, যাকে আবার অল্প (70-50), মাঝারি (50-25) এবং ভারী মাত্রার (25 এর নীচে) এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। শিশুর বুদ্ধি ও তার আচরণের দিকে দৃষ্টি রাখলে মায়েরা সহজেই বুঝতে পারবেন শিশুর মানসিক ন্যূনতা আছে কিনা। শিশু 3 মাস বয়সে মাথা তোলে, 6 মাসে ঠেস দিয়ে বসতে শেখে, 9 মাস থেকে এক বছরে হাঁটতে শেখে এবং এক থেকে দেড় বছরে কিছু শব্দ বলতে শেখে। পাঁচ বয়সের কমবয়স্ক শিশুর মানসিক ন্যূনতা যাচাইয়ে এই বুদ্ধির সময়সীমাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ বছরের বেশী বয়সীর মানসিক ন্যূনতা ধরা পড়ে স্কুলে পড়াশুনায় তার অগ্রগতি এবং বাড়ীতে ও বাইরে তার আচরণ দেখে। মানসিক ন্যূনতার কোন চিকিৎসা নেই। তবে যত আগে অবস্থাটা বোঝা যায় শিশুকে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে তাকে দৈনন্দিন কাজে তত স্বনির্ভরতা শেখানো চলে।

মানসিক ন্যূনতার কারণগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন। এগুলি হলো ঃ ক) জন্মের আগে—মায়ের অপুষ্টি, ডাক্তার না দেখিয়ে যথেচ্ছ ওষুধ খাওয়া, মায়ের হাম, সিফিলিস প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি এবং মদে আসক্তি, (খ) জন্মের সময়—বিলম্বিত প্রসব, ফরসেপ্‌সের ভুল ব্যবহার, বেশী রক্তক্ষরণ, জন্মের পরেই শিশুর নিঃশ্বাস না নেওয়া এবং গ) জন্মের পরে—শিশু স্বাভাবিক হয়ে জন্মালেও পরে তার মানসিক বৃদ্ধি নানা কারণে ব্যাহত হতে পারে। যেমন, শিশুর জন্ডিস, জ্বর বেশী হয়ে ফিট, মৃগী রোগ ইত্যাদি। যেহেতু মানসিক ন্যূনতার চিকিৎসা নেই, এই অবস্থা প্রতিরোধের বিষয়ে আমাদের যত্ন নিতে হবে, শিশুর বৃদ্ধির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ঃ

মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে অজ্ঞতা ও ও নানা কুসংস্কার ভীতি ও অবহেলা রয়েছে। আমাদের মনোরোগ চিকিৎসার

সত্রের

যেসব সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সার্বিক ব্যবস্থা নেই। এই সব অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বা 'গারদে' মনোরোগীকে ঢুকিয়ে দিয়েই আমরা কর্তব্য সারি, তাকে সমাজে পুনর্বাসন দিতে আমাদের অনীহা। এখনও আমাদের অনেকের ধারণা যে মানসিক রোগের যথাযথ চিকিৎসা নেই, এ রোগ সারে না। তাই এখনও অনেক শিক্ষিতজন মনোরোগ সারাতে দৈবী সহায়তার ওপর নির্ভর করেন। প্রকৃত তথ্য হলো এই যে বিগত ত্রিশ বছর ধরে মনোরোগের চিকিৎসায় এত অগ্রগতি হয়েছে যে অনেক মানসিক ব্যাধিই এখন বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় সারানো সম্ভব।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রধান তিনটি অংশ হলো—

ক) ভেষজ চিকিৎসা (ড্রাগ থেরাপি) : অ্যাকিউট সাইকোসিস ও মৃগী রোগে নিয়মিত ওষুধ ব্যবহারে পুরো সুফল পাওয়া যায়। অন্যান্য মানসিক ব্যাধিও ওষুধ ব্যবহার করলে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আনা যায়। মানসিক ন্যূনতায় কিন্তু ওষুধের কোন ভূমিকাই নেই।

ই. সি. টি. বা বিদ্যুৎ চিকিৎসা কিছু নির্বাচিত মনোরোগীর ক্ষেত্রে সুফল দেয়।

খ) মানস চিকিৎসা (সাইকোথেরাপি) : অনেক মনোরোগে সাইকোথেরাপি ভালো কাজ দেয়। রোগীর সমস্যা ধৈর্য ধরে শোনা ও তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া, পরিবারের সকলের সঙ্গে যৌথ আলোচনা করা, বাসস্থানের পরিবেশে রদবদল করে রোগীর জীবনে সুস্থিতি আনা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা মনোরোগীর অনেক উপকার করা সম্ভব।

গ) কর্ম চিকিৎসা (অকুপেশানাল থেরাপি) : ও পুনর্বাসন (রিহ্যাবিলিটেশান) : ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগীর ক্ষেত্রে পূর্ণ আরোগ্য অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সকলের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে অংশ গ্রহণ করিয়ে এবং কিছু নিয়মিত কাজে যুক্ত রেখে এসব ব্যক্তিদের অবস্থারও অনেক উন্নতি সম্ভব।

মানসিক রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার ও মনোবিদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, পরিবার তথা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা, ধৈর্য ও মমত্ববোধও সমান গুরুত্বের।

মনোরোগী এবং আমরা :

কোন মনোরোগীর সংস্পর্শে এলে আমাদের মনে এই সব মনোভাবের এক বা একাধিকটির উদয় হয়—

1. সন্দেহ ও ভয়—সে হঠাৎ কিছু ক্ষতি করবে।
2. বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা—সে নোংরা থাকে।
3. রাগ ও এড়িয়ে যাওয়া—সে বিরক্ত করে।
4. সহানুভূতি ও করুণা—সে রোগার্ত।
5. আমোদ ও পরিহাস—সে ছেলেমানুষী করে।
6. অবিশ্বাস—সে নির্ভরযোগ্য নয়।

নিজের পরিজন বা প্রতিবেশী কোন মনোরোগীর বিন্দুমাত্র উপকারও যদি আমরা করতে চাই, তাহলে তার প্রতি আমাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। মনোরোগীও নিজস্ব অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দ এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন মানুষ। সেও মানুষ হিসেবে মর্যাদা চায়। তার প্রতি অন্যের মনোভাব সে বোঝে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে। তাকে ভালোবাসলে ও বিশ্বাস করলে সেও তাই করে। সঙ্গে সহযোগিতা করলে সেও সহযোগী হয়ে ওঠে।

তাই মনোরোগীর সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সজাগ থাকা প্রয়োজন যে তাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি এ ভাবটি যেন প্রকাশ পায়। আমরা তাকে অবহেলা করে তার সম্পর্কে অন্যের বক্তব্য ও মতামত বিশ্বাস করলে তার চরম ক্ষতি করা হবে। তার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। কোন মন্তব্য, সমালোচনা বা পরিহাস একদম চলবে না। মনোরোগীর বিশ্বাস অর্জন করা তার উপকার করার প্রাথমিক শর্ত।

মনোরোগে আমাদের কী করণীয়?

মনোরোগীর চিকিৎসা অবশ্যই করবেন ডাক্তার, মনোবিদ এবং এ বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্যেরা, তবে সাধারণ জনগণ, আমাদেরও কিছু প্রাথমিক ও সহযোগী ভূমিকা আছে। তাই আমাদের অবহিত হতে হবে বিভিন্ন ধরনের মনোরোগীর প্রতি সাধারণভাবে বা জরুরী অবস্থায় আমরা কেমন আচরণ করবো।

ক) উত্তেজিত রোগীর ক্ষেত্রে—

1. রোগী বিরক্ত হয়, তার উত্তেজনা আরও বাড়ে এমন কোন কথা বলা বা কাজ করা থেকে অন্যদের নিরস্ত করুন। যাকে রোগী পছন্দ করছে না, তাকে সরে যেতে বলুন।

2. রোগীর সঙ্গে তর্ক বা বাদানুবাদ করবেন না।
3. রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করুন। তাকে বলুন 'তোমার কী হয়েছে আমাকে বলো। আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে সহায়তা করবো।'
4. রোগী মারমুখী হয়ে উঠলে তার সামনে কিছু দূরত্বে দাঁড়িয়ে তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করুন।
5. রোগী মারদাঙ্গা করতে থাকলে তার ওপর একটা কম্বল ছুঁড়ে দিন, অন্যদের সাহায্যে তাকে জড়িয়ে ধরুন এবং হাসপাতালে/ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। দড়ি বা শিকল দিয়ে তাকে কখনও বাঁধবেন না। নিতান্ত প্রয়োজন হলে লম্বা কাপড় দিয়ে হাতদুটো বেঁধে ফেলুন।
6. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে রোগীর উত্তেজনা কমে আসে। তাকে তখন কিছু খাদ্য ও পানীয় খেতে বলুন। তাকে বলুন যে তার কিছু ওষুধের প্রয়োজন এবং সেজন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

খ) আত্মমগ্ন রোগীর ক্ষেত্রে—

1. দীর্ঘ সময় ধরে তার সঙ্গে কথা বলুন।
2. তাকে কিছু খেতে বলুন।
3. তার আত্মহত্যার প্রবণতা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করুন।
4. কোন রোগী আত্মহত্যা করবে বলে শাসালে তার বক্তব্যে গুরুত্ব দিন। তার কাছে সব সময় কাউকে না কাউকে থাকতে হবে, যতক্ষণ না সে ডাক্তারী তত্ত্বাবধানে যাচ্ছে।
5. তার অবসাদের কারণ, জীবনে কেন বিতৃষ্ণা এসেছে জানার চেষ্টা করুন।
6. রোগীর সঙ্গে সখ্যতা হলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।

গ) সকলকে অবিশ্বাস করে এমন সন্দেহপ্রবণ রোগীর ক্ষেত্রে—

1. রোগীকে কোন মিথ্যা কথা বলবেন না, সত্য গোপন করবেন না।
2. তার বিশ্বাস বা সন্দেহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না, এগুলি যে ভুল ও ভিত্তিহীন তাকে বোঝাতে যাবেন না।
3. তার মুখে তার অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা শুনুন। যত বেশী সম্ভব তথ্য যোগাড় করুন। কোন মতামত দেবেন না।

4. তার খিদে ঘুম কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং তাকে বলুন যে এসব সারাতে তাকে ডাক্তার দেখিয়ে কিছুদিন ওষুধ খেতে হবে।

(ঘ) কাউকে চিনতে পারছে না এমন উদ্‌ভ্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে—

1. লক্ষ্য করুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খিঁচুনী ভাব আছে কি না। মৃগী রোগের বেলায় এমন হতে পারে।

2. ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা সন্ধান নিন।

3. মাথায় আঘাত লেগেছে কিনা বা মদ খেয়েছে কিনা খোঁজ নিন।

4. আত্মহত্যার জন্য কোন বিষ খেয়েছে কিনা।

5. খুব জ্বর আছে কিনা।

6. এ ধরনের রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে / হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

(ঙ) মৃগী রোগীর ফিট হলে—

1. রোগীর চারপাশে ভীড় জমতে দেবেন না, শক্ত জিনিষ বা আসবাব সরিয়ে রাখুন। রোগীকে একপাশে কাত করে শুইয়ে দিন, যাতে লালায় তার শ্বাসের ব্যাঘাত না হয়।

2. রোগীর দাঁতের পাটির মধ্যে কোন শক্ত জিনিষ ঢোকাবেন না।

3. তার হাত পা শক্ত করে ধরে রাখবেন না।

4. তাকে কোন পানীয় দেবেন না।

5. রোগীর হাতে লোহার চাবি দেওয়া বা তাকে জুতো শোঁকানো কিছুই করবেন না। ফিট আপনিই কমে আসবে।

6. অল্পবয়স্কদের কখনো কখনো ক্রমাগত ফিট হতে পারে। দুবার ফিটের মধ্যবর্তী সময়ে রোগী জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকে। কোন ব্যক্তির যদি প্রথম ফিটের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় ফিট হয়, তাকে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে।

মনোরোগের কিছু সঠিক তথ্য :

1. ভূতপ্রেত, তুকতাক, অশুভ শক্তি কিংবা দৈবী অভিশাপে মনোরোগ হয় না। দৈহিক ও সামাজিক কারণে মস্তিষ্ক কোষের কাজের ব্যত্যয়ের ফলে মনোরোগ হয়।

2. মনোরোগ সংক্রামক নয়।

3. হস্তমৈথুন বা রেতঃপাতের ফলে মনোরোগ হয় না।

4. মনোরোগের ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলেও আসক্তি জন্মায় না ; এগুলি ঘুমের ওষুধ নয়। ডাক্তারের নির্দেশমতো এগুলি কমিয়ে আনলে বা বন্ধ করলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

5. মনোরোগ হলেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় না। অনেকক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করলে রোগ বেড়ে যায়। কেবল বিশেষ কিছু ক্ষেত্রেই রোগীকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন হয়।

6. মনোরোগীর বিয়ে দিতে অবশ্যই ডাক্তারের মতামত নিতে হবে। বিয়ে মনোরোগ সারায় না, অনেকক্ষেত্রে বাড়িয়ে তোলে। যে রোগী সেরে উঠেছে, সে অবশ্য বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

7. মনোরোগী বিশেষত সাইকোসিসের রোগীর সন্তানের সাধারণ মাতাপিতার সন্তানের চেয়ে মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিছু বেশী থাকে। তবে সে মনোরোগী হবেই, এমন কোন কথা নেই। অধিকাংশই রোগীরই সন্তান স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করে।

8. মানসিক রোগীকে অবশ্যই দায়িত্বের কাজ দেওয়া চলে। অসুস্থ অবস্থায় কেবল কাউকে নজর রাখতে হয় ন্যস্ত দায়িত্ব সে কতটা পালন করছে। সেরে ওঠার পর সে নিজে নিজেই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে, খুব অল্প ক্ষেত্রে তদারকির দরকার হতে পারে।

9. মানসিক ন্যূনতায় কোন ওষুধ দিয়েই মস্তিষ্কের ঘাটতি পূরণ করা যায় না। তবে সহানুভূতির সঙ্গে বিভিন্ন কর্মশিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের শিশুদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব। বিয়ে দিলে মানসিক ন্যূনতা সারে না ; যাদের মানসিক ন্যূনতা বেশী মাত্রার, তারা আদপেই বিয়ের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য নয়।

সমাধান কোন পথে ?

মানসিক রোগী সম্পর্কে সমাজের উদাসীনতা ও বিরূপতার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই মানসিকতার ফলে আমাদের দেশে মনোরোগীর প্রযত্নের দিকে বিশেষ কোন ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে নি। সরকারী স্বাস্থ্য বরাদ্দের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যয়িত হয় মনোরোগ চিকিৎসার জন্য। সারা দেশে মোট 42 টি মানসিক হাসপাতাল আছে, যাদের সম্মিলিত শয্যাসংখ্যা 20000,

অর্থাৎ প্রতি চল্লিশ হাজার লোকপিছু একটি শয্যা। এদেশে মানসিক ব্যাধির ব্যাপ্তি কতটা, তা আমরা আগেই দেখেছি। অতএব এই শয্যাসংখ্যা যে কত অপর্যাপ্ত, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সংখ্যায় অপ্রতুল এই হাসপাতাল-গুলিতেও মনোরোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ভারতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা প্রতি দশলক্ষ লোকে একজন। এদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এইসব শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোবিদদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্নের সঙ্গে যুক্ত করা হয় না, শিক্ষা শেষে তারা জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশায় চলে যান। সরকারী ব্যবস্থার বাইরে বেসরকারী পর্যায়ে কিছু নার্সিং হোম ইত্যাদি আছে। সেখানে চিকিৎসিত হতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং তাতেও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা মেলে না। মানসিক রোগীদের জন্য বৃত্তিশিক্ষা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সারা দেশে নেই বললেই চলে।

ভারতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যেটুকু মানসিক প্রযত্নের ব্যবস্থা আছে, তা প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে, যেখানে আমাদের বেশীর ভাগ জনগণ এবং বেশীর ভাগ মনোরোগীর বাস, মানসিক রোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবমতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মানসিক রোগের ব্যাপকতার মাত্রা ভারতের মতোই সমান মাপের। তাই 1978 সালে আলমা আটায় 2000 সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যর যে শপথ নেওয়া হয়েছিলো, তাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রযত্নের আটটি আশু করণীয় বিষয়ের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্নও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত সরকার 1982 সালে ঘোষিত ন্যাশনাল মেণ্টাল হেলথ প্রোগ্রামে মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্নকে সার্বিক স্বাস্থ্য প্রযত্নের অঙ্গীভূত করার নীতি ঘোষণা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার অন্যান্য রোগের মত মানসিক রোগেরও চিকিৎসা করবেন। এজন্য কর্তব্যরত প্রতি ডাক্তারকে মানসিক রোগ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা থাকলেও কিন্তু সমাজের অপরিসীম ভূমিকার গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না। প্রকৃত বিচারে **মনোরোগের চিকিৎসার বেশীটাই নির্ভর করে এক সহানুভূতিশীল সামাজিক পরিবেশের ওপর।**

কোন পরিবারে কারুর মানসিক রোগ হলে সামাজিক প্রতিকূলতার ভয়ে সেটা সযত্নে গোপন করার চেষ্টা হয়। যথাসর্বস্ব ব্যয় করে গোপনে দৈবী

অদৈবী পন্থায় রোগীর নিরাময়ের চেষ্টা চলে। অতঃপর হতাশ মাতাপিতা সামাজিক নির্মমতার আশংকায় একমাত্র সন্তানের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করেন, এ দুঃখজনক ঘটনা নিতান্ত অল্প নয়। এই নির্মমতা ও অসহায়তার প্রেক্ষাপটটি আমাদের বদলাতে হবেই। আমাদের বুঝতে ও বোঝাতে হবে যে শারীরিক ব্যাধির মতোই মনোরোগও নিরাময়যোগ্য ব্যাধি। একথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের বর্তমান অসুস্থ আর্থসামাজিক পরিবেশে যে কোন সময় যে কোন লোক মনোরোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং এই সমস্যা উত্তরণে সমবেতভাবেই আমাদের এগোতে হবে। □

জনস্বাস্থ্য প্রকাশন

(নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের একটি প্রকল্প)

আমরা প্রকাশ করেছি ঃ

পেটের অসুখ (তৃতীয় সং)	ডাঃ তাপস সেন	দুই টাকা
অপুষ্টি (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ গোপাল দাস	দুই টাকা
রোগ প্রতিরোধে টিকা (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সমীর কুণ্ডু	দুই টাকা
এসব ওষুধ খাবেন না (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	দুই টাকা
কৃমি সংক্রমণ (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সুব্রত ধর	দুই টাকা
রক্তাল্পতা (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ কমলেশ দাস	দুই টাকা
জ্বর	ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল	দুই টাকা
কাশি	ডাঃ দুর্জয় দাস	দুই টাকা
প্রসঙ্গ ওষুধ	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	দুই টাকা
জলবাহিত রোগ	ডাঃ রণবীর পাল	দুই টাকা
মশকবাহিত রোগ	ডাঃ শতদল দাস	দুই টাকা
চিকিৎসা না বিভ্রান্তি ?	ডঃ পি. জি. রায়	দুই টাকা
জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা (দ্বিতীয় সং)	শ্রী কালিদাস সমাজদার ও শ্রী বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত	দুই টাকা
প্রসূতি পরিচর্যা	ডাঃ ধীমান মৈত্র	দুই টাকা
সুস্থভাবে বাঁচতে হলে (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য ডাঃ কৃষ্ণ মিত্র ও শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	তিন টাকা
মানসিক ব্যাধি	ডাঃ লালমোহন ঘোষ	আড়াই টাকা

দুই মাস পর পর নতুন নতুন বিষয়ে আমাদের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং সকল প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব
নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন
244-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-700020 (ফোন ঃ 28-9646)

লেখক পরিচিতি : ডাঃ লালমোহন ঘোষ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ডাঃ ঘোষ জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে আমাদের সহযোগী এবং আমাদের আবাসিক মানসিক স্বাস্থ্যপ্রকল্পের অন্যতম রূপকার।

- 1988 সালের সহযোগীসদস্য চাঁদা 15/- টাকা। সহযোগী সদস্যরা 1988 সালে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাসহ সব বই সাধারণ ডাকে পাবেন।
- পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা এবং অন্যত্র উপযুক্ত শর্তে বিক্রয়-সহযোগী চাই।
- মোট মূল্য কুড়ি টাকার কম হলে বই ভি.পি.পি. ডাকে পাঠানো হয় না। মোট দামের অন্তত অর্ধেক অগ্রিম পাঠাতে হবে।
- জানুয়ারী, মার্চ, মে, জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বই প্রকাশিত হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় এবং বীরভূম জেলার লাভপুরে আমাদের আবাসিক মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমির ব্যবস্থা হয়েছে। এই অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রকল্পটিকে রূপায়িত করতে আপনিও এগিয়ে আসুন। কিশোর-কিশোরী মনোরোগীর পিতামাতারাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন'-এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস, 1/5/1এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-700012 হইতে মুদ্রিত।